# সংকেত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

এ সপ্তাহে আরো দু'হাজার লোক পাগল হয়ে যাবে, বিভিন্ন কল-কারখানা, অস্ত্রাগার, বিমান, সড়ক ও রেলপথে অন্তর্ঘাতের দেড়শ' ঘটনা ঘটবে। জ্ঞানী, গুণী, চরিত্রবান মানুষেরা প্রকাশ্যে অপমানিত হবেন, মানুষে মানুষে ঝগড়া, বিবাদ, খুনোখুনি, দাঙ্গা ক্রমশ বাড়বে। অকারণ হত্যাকাণ্ড ঘটবে বহুল পরিমাণে। কেউই কোথাও নিরাপদ নয়। বড় বড় শহর শূন্য হতে থাকবে আরো। টিপসি সুলতান আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছে এ সপ্তাহে এবং আগামী সপ্তাহগুলোতে খুবই সতর্ক থাকুন। মনে রাখবেন, আপনার প্রাণ, সম্পত্তি ও সম্মান আপনাকেই বাঁচাতে হবে। আপনার আর কেউ নেই, আপনি একা।

লম্বাটে, রোগাটে এবং ফর্সা ধরনের লোকটার নাম অমিত, অফিস থেকে ফেরার পথে অমিত রোজকার মত অফিস বাড়ির ত্রিশ তলার ছাদে উঠে নিজের বাতাস-গাড়িতে চড়ে বসেছিল। কাচের বুদ্বুদের একটি ঢাকনার মধ্যে চমৎকার গদির আসন, দু'জনে বসতে পারে তাতে। আসনের নিচে সিলিন্ডার এবং অন্যান্য যন্ত্র লাগানো। কয়েকটা বোতাম টিপে আর একটি হাতল ধরে চালাতে হয়। সিলিন্ডার থেকে নিম্নমুখী প্রবল জ্বলন্ত গ্যাস নিষ্কাশিত হয়। তারই উল্টো চাপে বাতাস-গাড়ি শূন্যে ভেসে যায়। খুব জোরে নয়, ঘন্টায় বড়জোর দু'শ' কিলোমিটার। বেশি দূর যাওয়ায় যায় না।

সিলিন্ডারে যে পরিমাণ গ্যাস ভরা যায় তাতে যন্ত্রটা মোটামুটি তিন ঘন্টা নিরাপদে উড়তে পারে। দুর্ঘটনার ভয় নেই। গ্যাস হঠাৎ ফুরোলেও চলন্ত বাতাস-গাড়ি আছড়ে পড়বে না। গ্যাস ফুরোলেই একটা প্যারাসুট আপনা থেকে খুলে যায়। বাতাস-গাড়ি ভাসতে ভাসতে নিচে নামে।

মাটির খুব কাছাকাছি এলে প্যারাসুট কাজ করে না, তখন বোতাম টিপলে ভিন্ন সিলিন্ডারের মধ্যে দুটো মিশ্রণের মিলন ঘটে হিলিয়াম গ্যাস তৈরী হয়ে যায়। সেই গ্যাস বাতাস-গাড়িকে মাধ্যাকর্ষণের টান থেকে বাঁচিয়ে ধীরে প্রায় হাত ধরে নামিয়ে দেয়।

অমিত বাতাস-গাড়িতে উঠে যন্ত্র চালাতে গিয়ে বুঝতে পারল সিলিন্ডারে এক ফোঁটা গ্যাস নেই। নেমে দেখল, সিলিন্ডারের বর্মের মতো ইস্পাতের গায়ে একটা নিখুঁত ছ্যাঁদা। এই ইস্পাত ফুটো করা সহজ নয়। কিন্তু আজকাল এতসব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বেরিয়েছে আর তা এতই সহজলভ্য যে, যে কেউ তা যখন তখন ব্যবহার করতে পারে।

তার বাতাস-গাড়িটিকে বিকল করে কার কী লাভ তা অমিত জানে না। ইদানীং প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা নানাজনের ঘটেছে। তার ঘটলো এই প্রথম।

আকাশে অবশ্য অজস্র উড়ছে বাতাস-গাড়ি। তাদের মধ্যে ভাড়ার গাড়িও আছে। ভাড়াটে গাড়িগুলোর তলদেশ গাঢ় লাল, সে রকম কয়েকটা গাড়ি দেখতে পেয়ে গুণ তার কব্জির ঘড়ির বোতাম টিপে ধরে ঘড়িটা আকাশের দিকে তুলে নাড়তে লাগলো। সাদা চোখে কিছু দেখা যায় না বটে কিন্তু ঘড়ি থেকে একটা বিদ্যুৎ চৌম্বক ঢেউ গিয়ে লাল বাতাস-গাড়ির একটা এ্যান্টেনাতে জানান দেয় যে, কেউ গাড়ি চাইছে।

কোন কাজ হলো না। সবক'টা ভাড়াটে বাতাস গাড়ির নিচেই হলুদ আলো জ্বলছে, তার মানে সওয়ারী আছে। এই অফিস ছুটির সময় খালি গাড়ি পাওয়ার ভরসাও অমিতের ছিল না।

অমিত অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বাতাস-গাড়ির কঠিন ইস্পাতের সিলিন্ডারে রহস্যময় ছিদ্রের কথা ভাবতে ভাবতে আকাশে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। আকাশ ভরে গেছে বাতাস-গাড়িতে। অজস্র অফিসের ছাদ থেকে হাজার হাজার বাতাস-গাড়ি ধীর গতিতে আকাশে উঠে বোঁ বোঁ করে ছুটে যাচ্ছে চতুর্দিকে। তাদের লেজের জ্বলন্ত আগুন অবিকল হাউইয়ের মত দেখাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রবল শিসের মত শব্দ। হাজার হাজার বাতাস-গাড়ির শিস কান ঝালাপালা করে দেয়।

অমিত কিছুক্ষণ বোকার মত দাঁড়িয়ে থেকে। তাদের অফিসের কাছে প্রায় শ'তিনেক বাতাস-গাড়ি রোজ জড়ো হয়। সেগুলোর মধ্যে এখন গুটিচারেক মাত্র পড়ে আছে, অমিতেরটা নিয়ে। বাকি তিনটি অমিতের ওপরওয়ালাদের। . ওপরওয়ালাদের গাড়িতে লিফট পাওয়ার কথা ভাবতেও পারে না অমিত। তবে সে একটু দাঁড়িয়ে গাড়িগুলো দেখল। ওপরওয়ালাদের বাতাস-গাড়িগুলো অনেক বেশি দামি। সেগুলোতে চার-পাঁচজনের বসবার আসন রয়েছে, ভিতরে টেলিভিশন লাগানো। সিলিন্ডার অনেক বড়। কম করে হাজার কিলোমিটার যাওয়ার মত গ্যাস তাতে ভরা যায়। এ রকম একটা বড় বাতাস-গাড়ি কেনার ইচ্ছে তার বহুদিনের। কিন্তু হয়ে উঠছে না।

ভাবতে ভাবতে অমিত লিফটে একতলায় নেমে রাস্তায় পা দেয়। রাস্তায় সারি সারি মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। রোলস রয়েস, ক্যাডিলাক, মারসিডিজ। পুরনো আমলের যানবাহন। এখন কেউই পারতপক্ষে মোটরগাড়িতে চড়ে না সারি সারি গাড়ি সওয়ারীর জন্য রাস্তায় হা-পিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

অমিত রাস্তায় পা দিতে না দিতেই গাড়ির ড্রাইভাররা ডাকাডাকি শুরু করে, 'আসুন মহারাজ, আসুন। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দেব। অ্যাক্সিডেন্টের কোন ভয় নেই।'

অমিত হাসল। সে থাকে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে। মোটরে গেলে কম করেও মিনিট চল্লিশেক লাগবে। কিন্তু সময় বড় মূল্যবান। অবশ্য একথা ঠিক, মোটর গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্টের ভয় কম। সড়কপথে আজকাল ভারী মালের গাড়ির আর কদাচিৎ কয়েকটি মোটর চলে। তাই শহরের বিশাল চওড়া রাস্তাগুলো প্রায় ফাঁকা পড়ে থাকে, অব্যবহারে রাস্তাগুলোতে শ্যাওলা পড়ছে। তাই ফাঁকা রাস্তায় দুর্ঘটনা বড় একটা ঘটে না। অন্যদিকে আকাশে কিন্তু দুর্ঘটনা বাড়ছে। বাতাস-গাড়িগুলোর গতিপথের উচ্চতা নির্ধারিত না থাকায় প্রায়ই ধাক্কা লাগে। লোক মরে। তবু গতি ও সময়ের দিক থেকে বাতাস-গাড়ির তুলনা হয় না। অমিত একবার ওপরের দিকে তাকালো। শহরের সিকি মাইল পর্যন্ত অজস্র বাড়ির ছাদ উঠে গেছে, বহু উঁচু দিয়ে গেছে ফ্লাইওভার। তাছাড়া টাওয়ার, হেলিপ্যাড আর শূন্যে স্থাপিত বিশেষ ধরনের বিমানবন্দর। আছে রকেট স্টেশন। সুতরাং এই বিশশ' বিশ সালে কলিকাতার রাস্তায় দাঁড়ালে আকাশ দেখা খুবই দুঃসাধ্য। অমিত ফাঁকা রাস্তা

পার হয়ে চলন্ত ফুটপাতে দাঁড়াল। কিছুদূর গিয়ে ভূগর্ভের ট্রেন ধরতে এসকালেটরে পাতালে নামবার আগে সে একটা স্টলের শ্লট মেশিনে পয়সা ফেলে বিকালের খবরের কাগজ কিনে নিল।

নামে কাগজ। আসলে সংবাদপত্র আজকাল ছাপা হয় পাতলা পলিথিনের ওপর। অসম্ভব সুন্দর ছাপা। হাজার রঙে রঙিন সব ছবি কমিকস, বিজ্ঞাপন। পুরনো সংবাদপত্র রাখার জন্য ট্রে থাকে। সেখানে জমা হওয়া সংবাদপত্র আবার ফেরত যায়। পলিথিনের ওপর থেকে সব ছাপা ছবি ও অক্ষর মুছে আবার পরের দিনের সংবাদপত্র ছাপা হয়।

এসকালেটরে অজস্র মানুষের ভিড়। গায়ে গায়ে লোক দাঁড়ানো। তার মধ্যে দাঁড়িয়েই অমিত কাগজ পড়তে থাকে। এত সুন্দর ছাপা সংবাদপত্রে কিন্তু আনন্দের খবর অল্পই আছে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে মনোরোগ। শুধু যে পাগলামীর বাড়-বাড়ন্ত তা নয়, মনোরোগের হাজার রকম প্রকারভেদ দেখা যাচ্ছে। কখনো তীব্র নিঃসঙ্গতাবোধ, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, ইচ্ছাকৃত বিশ্বাসঘাতকতা, কুঁড়েমি, যৌন অতিচার, সন্দেহবাতিক ইত্যাদি থেকে মনোরোগ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত শতাব্দী থেকে যথেচ্ছ বিবাহ ও রক্তের মিশ্রণের ফলে জীনমালা বিশৃঙ্খলা হয়েছে। ঐ দোষ দূর করা শতাব্দীর কাজ।

আজ খবরের কাগজে দিয়েছে, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার আশি শতাংশই মনোরোগী। এদের মধ্যে আবার পঁচিশ শতাংশ সুস্পষ্টভাবেই উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত। উন্মাদের মধ্যে আবার নব্বই শতাংশই হিংস্র ও বদমেজাজী। মনোরোগীদের এক বড় অংশের মধ্যে চাপা জিঘাংসা রয়েছে। এরা খুব সামান্য কারণে বা বিনা কারণেও যে কোন পুরুষ, নারী বা শিশুকে হত্যা করতে পারে।

রোজই সংবাদপত্রে নতুন নতুন মনোরোগীদের পরিসংখ্যান দেয়া হয়। আজ জনাপনেরো বিশিষ্ট ও অবিশিষ্ট লোকের তালিকা দেয়া হয়েছে, যারা গত চব্বিশ ঘন্টায় স্বাভাবিক মানসিকতা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন।

খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নিচে ডানদিকের কোণে সপ্তাহে একবার টিপসি সুলতানের ভবিষ্যদ্বাণী বেরোয়। আশ্চর্য এই, ঘোরতর টেকনোলজির যুগেও এই ছদ্মনামের আড়াল থেকে একটি লোক নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করে যায়। টিপসি সুলতানের কোন টিপস ব্যর্থ হয় না। কোথায় ঝড় বা ভূমিকম্প হবে কিনা, মহাজাগতিক রশ্মি কোথায় কখন কতটা ক্ষতি করবে, কোন মানুষের শরীরের দুর্জ্ঞেয় অভ্যন্তরে কোন জটিল রোগ দেখা দিয়েছে তা বৈজ্ঞানিকরা হুবহু বলতে পারেন। কিন্তু টিপসি সুলতান আরো এক ধাপ এগিয়ে তার টিপস দেয়। বৈজ্ঞানিকদের চেয়েও তা অনেক বেশি অব্যর্থ। কয়েক সপ্তাহ আগে টিপসি বলেছিল, এক বিশেষ তারিখে চাঁদের উপনিবেশে প্রচণ্ড উল্কাপাতের ফলে প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। তাই হয়েছিল। ওই বিশেষ দিনে চাঁদের বৈজ্ঞানিক উপনিবেশে উল্কাপাতের ফলে ফটো প্রসেসিং ল্যাবরেটরির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়, কয়েকজন মারা যায়, জনাকুড়ি কর্মী গুরুতর আহত হওয়ায় তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পাগলামির লক্ষণ ডাক্তাররা খুঁজে পাওয়ার অনেক আগেই টিপসি তা জনসাধারণকে জানিয়ে দিয়েছিল।

আজকের কাগজে টিপসি যে টিপস দিয়েছে তাও বড় হতাশাব্যঞ্জক।

অমিত রেলের দুটি স্তর পেরিয়ে একেবারে নিচের তলায় নেমে এসে এসকালেটর ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। ওপরতলার দুটি স্তরে দূরপাল্লার পাতাল রেল চলে। অল্প পাল্লার ট্রেন চলে সবচেয়ে গভীর পথে। ভিড় এইসব ট্রেনেই বেশি। এসকালেটর উগরে দিচ্ছে হাজার হাজার মানুষ।

প্লাটফর্মে ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন ডাকল– 'অমিত' মহিলার গলা।

অমিত খুব আস্তে ঘাড় ঘোরালো। দেখল কাচতন্তুর কৃত্রিম পশমের শাড়ি পরা প্রকৃতি দাঁড়িয়ে। প্রকৃতি দেখতে খুব সুন্দর নয়। কিন্তু আজকাল নিজের চেহারাকে নতুন ছাঁচে ঢালার এমন ব্যাপক হয়েছে যে, হরদম লোকের চেহারা বদলে যাচ্ছে। খুব চেনা লোককেও চেনার উপায় থাকে না। প্রকৃতি তার মুখখানাকে আগের চেয়ে অনেক সুন্দর করেছে। ছোট চোখ চিরে বড় করিয়েছে, মোটা ঠোঁট পাতলা করেছে। তবে একেবারে আমূল পাল্টে ফেলেনি। এখনো চেনা যায়।

অমিত এক পা এগিয়ে বলল, ‘কোথায়?’

সম্বিতি– ‘টোকিও। কাল ফিরব।’

অমিত বলে, ‘এরাড্রামে যেতে বাতাস-গাড়িই তো ভালো ছিল।’

সম্বিতি একটু মজার হাসি হেসে বলল, ‘তোমারটা কই?’

‘সিলিন্ডার ফুটো।’

‘আমারও।’

সে কী! অমিত চমকে জিজ্ঞেস করে।

সম্বিতি তেমনি হেসেই বলে, ‘উঠতে গিয়ে দেখি, গ্যাস নেই, সিলিন্ডার ছ্যাঁদা। স্কুলের কোন দুষ্টু বাচ্চার কাজ।

অমিত চিন্তিতভাবে বলে, ‘দুষ্টু বাচ্চা? কৈ, আমার অফিসে তো দুষ্টু বাচ্চা নেই। তবে আমারটায় কী করে হল?’

সম্বিতি ঠোঁট উল্টে বলে, ‘কে জানে! ঝিমি কেমন?’

ভাল। তবে অনেক প্রেমিক তার, আমি বেশি পাই না।

আমার অত প্রেমিক ছিল না।

তা বটে। বলে অমিত প্রকৃতির দিকে নিস্পৃহভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। সম্বিতি ছিল তার তৃতীয় বিয়ের বউ। বছর চারে আগে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন অমিতের দশম বিয়ের বউ ঝিমির সঙ্গেও তেমন বনিবনা হচ্ছে না, বিচ্ছেদ আসন্ন। স্ত্রীদের প্রেমিক থাকবে, স্বামীদের প্রেমিকা– এ যুগে এটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু ঝিমির প্রেমিকের সংখ্যা এত বেশি যে, তাকে অমিত সাতদিনেও একদিনের জন্য পায় কিনা সন্দেহ। জিমি এর আগে আরো সাতবার বিয়ে করেছে– সব স্বামীরই একই অভিযোগ। অমিত সম্বিতিকে বলল, ‘তোমার চতুর্থ বিয়ে হবে বলে শুনছিলাম। কী হল?’

করছি না। ও পাট এবার তুলে দেবো। বিয়ে নয়।

বিয়েটা অবশ্য বাহুল্য মাত্র। আজকাল বিয়ে হয় হাতেগোনা সংখ্যায়। বিয়ে ছাড়াই মেয়ে-পুরুষে একসঙ্গে থাকাটা প্রায় রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেল। অমিত বলল, ‘আমিও তাই ভাবছি।’

ঝিমিকে ছেড়ে দেবে?

নিশ্চয়ই।

তুমি?

আমি জেফরের কাজে থাকছি।

জেফরে? যে বিশাল চেহারার কানাডিয়ান ছেলেটা স্থির বিমান কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার?

সম্বিতি ঠোঁট উল্টে বলে, ‘চেহারাই বিশাল। আসলে কোন উত্তেজনাই নেই। ভেড়া।’

অমিত চুপ করে থাকে। মেয়েরা ছেলেদের কাছে প্রচুর শারীরিক উত্তেজনা আশা করে। কিন্তু সেটা কি আর সম্ভব। সর্বশেষ আদম সুমারিতে দেখা গেছে, পৃথিবীতে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা আড়াই গুণ বেশি। অসম হারের দরুন একজন পুরুষকে গড়ে আড়াইটি মেয়েকে খুশি করার ভার নিতে হয়। এটা অংকের হিসাব। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা আরো জটিল। মানুষের মধ্যে আজকাল একটা বিশাল শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, নিস্পৃহ নামে অভিহিত করা হয়। এর হল অতিরিক্ত যৌন মিলনের শিকার। দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে এরা সম্পূর্ণ অক্ষম। নির্বীর্য

তো বটেই, উপরন্তু মেয়ে ছেলের নাম শুনলে পর্যন্ত ভয় পায়। এইসব পুরুষেরা অধিকাংশই সমাজ-সংসার থেকে বহুদূর কোন নির্জন দ্বীপে বা জঙ্গলে গিয়ে বসবাস করে। পরিসংখ্যানে এরা পুরুষ গণ্য হলেও কার্যত পুরুষ নয়। ফলে সক্ষম পুরুষের সংখ্যা বড়ই কম। সক্ষমদের প্রতিদিন এত বেশিসংখ্যক মহিলার সন্তুষ্টি বিধান করতে হয় যে, তাদের আর কোনরকম মহিলা প্রীতি থাকে না। বেচারা জেফরেকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

অমিত একটু হেসে বলল, 'টোকিও কোথায় যাচ্ছ? মা-বাবার কাছে?'

মা মারা গেছেন পরশু।

ও।

সুইসাইড।

অমিত ভ্রু তুলে বলে, 'হঠাৎ? কি হয়েছিল?'

সম্বিতি ভ্রু কুঁচকে কি একটা ভাবছিল অন্যমনস্কভাবে বলল, 'পুরনো আমলের লোক, ওদের মনে নানারকম সংস্কার। কিছু একটা মনের ব্যাপার হয়েছিল। বাবা টেলিফোনে বলল, তোমার মা সুইসাইড করেছে। ব্যস, ঐটুকুই জানি।'

'তোমার যাওয়ার দরকার কি? ডেড বডি তো এতক্ষণে ফারটিলাইজারের কারখানায় পাচার। বোধহয় তা দিয়ে মণ্ড তৈরি হয়ে গেছে।'

সম্বিতি হেসে বলল, 'ওসব সেন্টিমেন্টের ব্যাপার নয়, মা মারা যাওয়ায় বাবা খুব একা, ওরা একটা ছোট্ট দ্বীপে একদম একা একা থাকত। মা মারা যাওয়ায় বাবা আরও একা। বোধহয় সহ্য করতে পারছে না।'

'আবার বিয়ে দাও।'

সম্বিতি হেসে বলে, 'দেখি। কিন্তু বাবা তো খুব অথর্ব। হাঁটাচলাও করতে পারে না ভাল করে। যাচ্ছি, দেখি কি করা যায়।'

প্রায় নিঃশব্দে বিদ্যুৎগতি ট্রেনটি এলো। এই ট্রেনের চাকা নেই, এয়ার কুশনের ওপর দিয়ে চলে।

সম্বিতি আর অমিত প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে একটা কামরায় উঠে দাঁড়াল। আশেপাশে সব মানুষই অন্যমনস্ক, নিস্পৃহ। প্রায় কেউই কারও দিকে তাকায় না। গায়ে ধাক্কা লাগলে বা পায়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে কেউ কারও কাছে দুঃখ প্রকাশ বা ক্ষমা প্রার্থনা করে না। গায়ে পড়ে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। মানুষকে আজকাল বোবায় ধরেছে।

অমিতের হাতের কাগজটা দেখে সম্বিতি হেসে জিজ্ঞেস করে, 'টিপসি কি বলছে?'

'খারাপ।'

সম্বিতি মাথা নেড়ে বলে, 'প্রায়ই তাই বলছে। এবার কতটা খারাপ?'

'খুব।'

'টিপসি সব সময় খারাপ দেখে, আমি দেখি না।'

খারাপ নয়?

সম্বিতি মাথা নেড়ে বলে, 'না। বেশ তো আছি।'

পাগলামি বাড়ছে।

তাতে আমার কি?

মানুষের ভাবনা-চিন্তা আজকাল সোজা পথে চলে। যতক্ষণ আমি ভাল আছি ততক্ষণ দুনিয়া রসাতলে গেলেই বা আমার কি?

কি কারণে কে জানে, অমিত এখনও ওরকম ভাবতে পারে না। সে এখনও আর পাঁচজনকে নিয়ে ভাবে। অমিত বলল, 'খুন হবে।'

হোক। যা ভিড় চারদিকে। লোক কমলে বাঁচি।

যদি তুমিও খুন হও?

যতক্ষণ তা না হচ্ছি ততক্ষণ তো সব ঠিক আছে। সম্বিতি খুব নিস্পৃহ গলায় কথটা বলে।

অমিত চুপ করে থাকে।

অমিতের পিছনেই একজন নগ্ন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর ভিড়ের চাপে অমিতের শরীরের সঙ্গে লেপটে যাচ্ছে। হয়তো এই গা ঘষাঘষির মধ্যে মেয়েটির নিজেওর কিছু অভিসন্ধি থাকতে পারে। অমিত একবার পিছন ফিরে মেয়েটিকে নিষ্কাম চোখে দেখল ভারী সুন্দর চেহারারা মেয়েটি মৃদু হাসে।

অমিত হাসিটা ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে একটু সরে দাঁড়ায়। বহুদিন হল তার কামেচ্ছায় ভাঁটা পড়েছে। এ মেয়েটি তাকে শরীরের আমন্ত্রণ জানাতে চাইলেও সে তা রক্ষা করতে পারবে।

সম্বিতিও মেয়েটিকে দেখল। ভাবলেশহীন মুখে অমিতের দিকে একবার চেয়ে বলল, 'আমি এবার নামছি'।

অমিত মাথা নাড়ল। ট্রেন থামল এবং সম্বিতি নেমে গেল অজস্র লোকের সঙ্গে। বসার জায়গা পেয়ে অমিত বসল। সেই নগ্ন মেয়েটি তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, বসার জায়গা পায়নি। দাঁড়িয়ে হাসছে। অমিত শিউরে চোখ বন্ধ করে থাকে।

নগ্ন মেয়েটি তার অনিচ্ছা লক্ষ্য করেই বোধ হয় ধীরে ধীরে এক প্রৌঢ়ের দিকে এগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

অমিত সংবাদপত্রটি বের করে আবার পড়তে থাকে। টিপসি সুলতানের ভবিষ্যদ্বাণীই আবার পড়তে থাকে সে। ভ্রূ কুঁচকে যায়। চিন্তার রেখা পড়ে মুখে।

টিপসি কি ছদ্মনামের আড়ালে কোন মানুষ? না কি অত্যাধুনিক কোন কম্পিউটার? টিপসির এসব টিপ্‌স কি ইনটুইশন না ক্যালকুলেশন? এ নিয়ে আরও লক্ষ লোকের মত গুণও ভাবে। আজ পর্যন্ত টিপসির প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে বিন্দুমাত্র হদিশও কেউ পায়নি। কিন্তু টিপসির টিপসগুলো বড় চমকপ্রদ।

অমিত চোখ তুলে কামরার ছাদের কাছে কাচের প্যানেলের গায়ে তাকাল একের পর এক স্টেশনের নাম ফুটে উঠেছে। ট্রেন স্টেশনে থেকেই আবার দৌড়চ্ছে। অমিত উঠল, পরের স্টপই তার।

দরজার কাছ-বরাবর সে দেখতে পেল সেই নগ্ন মেয়েটি আর প্রৌঢ় ভদ্রলোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মেয়েটি রাগে ফুঁসছে। প্রৌঢ় কিন্তু শক্ত চেহারার লোকটি কঠিন গলায় বলল, না।

মেয়েটি সপাটে একটা চড় কষাল লোকটার গালে। লোকটাও মেয়েটির ডান হাত মুচড়ে ধরল ভয়ঙ্করভাবে।

রাস্তায় ঘাটে এ রকম হামেশাই ঘাটে। কেউ গা করে না, তাকিয়েও দেখে না। অমিতের একটু খারাপ লাগল। প্রৌঢ়ের মুখটা তার চেনা-চেনা। একটু এগিয়ে সে দুজনের মাঝখানে পড়ে। মেয়েটির দিকে চেয়ে বলে, 'পুতুল-সঙ্গীর তো অভাব নেই'।

মেয়েটি তেমনি ফুঁসছে। প্রৌঢ় তার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়। মেয়েটি অমিতের দিকে চেয়ে বলে, 'পুতুল-সঙ্গী চাই না। রক্তমাংস চাই। দেবে?'

অমিত ম্লান হাসে। মেয়েদের সন্তুষ্ট করার জন্য কৃত্রিম পুতুল সঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছে অনেকদিন। প্রথম প্রথম মেয়েরা তাতেই খুশি ছিল। ঠিক মানুষের আকারে প্রকারে তৈরি এবং সবরকম যৌন মিলনের প্রক্রিয়ায় দক্ষ এসব কলের মানুষে মেয়েরা আর তৃপ্ত হচ্ছে না, তারা মানুষ চাইছে।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, 'উপায় নেই'।

'তোমাদের সকলেরই এক কথা। কেন? মেয়েটা প্রবল রাগ মেশানো অভিমানের গলায় বলে।

ট্রেন থামতেই অমিত নেমে পড়ে। মেয়েটাও। প্রৌঢ় নামে না।

স্টেশনে নেমে হঠাৎ অমিতের মনে পড়ল ঐ প্রৌঢ় তার বাবার ছোট ভাই। এক সময়ে বাবার ছোট ভাইকে কাকা বলার নিয়ম ছিল। এখনো কেউ হয়তো ডাকে। অমিত নিজে অবশ্য কখনো কাকা-জ্যাঠা বলে কাউকে ডাকেনি। আগের দিনের উল্লেখ করল, বাবার কাছে গেল, তেমনটাও আজকাল কদাচিৎ হয়। বাবা-মার প্রতি অতখানি কর্তব্য করার কোন মানেই আজকাল নেই। অমিত নিজের বাবাকে দেখে না প্রায় পনেরো বছর, সে লোকটা এ শহরেই থাকে। তার মা বহুকাল আগে বাবাকে ছেড়ে গেছে। মাকেও বহুকাল দেখেনি অমিত। হয়তো মা এদেশে নেই, হয়তো মরে গেছে।

অমিত অন্যমনস্ক ছিল বলে প্রথমটার টের পায়নি যে, নগ্ন মেয়েটি তার প্রায় গা ঘেঁসে হাঁটছে। মেয়েটির কনুইয়ের ঠেলা খেয়ে সচেতন হয়ে অমিত তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখল। বছর কুড়ির বেশি বয়স হবে না। ভারী সতেজ, সুন্দর দীঘল চেহারা। মুখশ্রী অসাধারণ সুন্দর। মেয়েটি অর্থপূর্ণ একটু হাসে।

অমিত মাথা নেড়ে বলে, না।

কামবোধ করতে আজকাল অমিতের কিছু নেই। আরও বহুকাল বোধটা জাগবেও না। কিন্তু এই কামকাতরা মেয়েটির জন্য তার একটু কষ্ট হচ্ছিল। সব মেয়ের জন্য হয় না, কিন্তু এ মেয়েটির মুখে কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে।

মেয়েটি হাল ছাড়েনি। অমিতের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তোমরা সবাই ফিরিয়ে দিচ্ছ, আমি কোথায় যাব?

অমিত বলতে পারত, পুতুল-পুরুষের কাছে যাও। কিন্তু তা বলল না। অমিতের এখুনি বিশেষ কোথাও যাওয়ার নেই। জিমি পরশু তার চারজন প্রেমিককে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের এক মাইল গভীরে জলের নিচের শহর রিদম-এ বেড়াতে গেছে। সমুদ্রের নিচে এখন হাজারটা শহর, তার মধ্যে রিদম সবচেয়ে কুখ্যাত। শুধু প্রমোদ আর যথেচ্ছাচার ছাড়া সেখানে আর কোন কর্ম নেই।

তিতিরের কাছেও গুণ কয়েক দিন যাবে না। তিতিরের পেটে ক্যানসার হয়েছে, সে আছে হাসপাতালে। সেরে উঠে স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে তার এখনো দিন দশেক লাগবে। মৈত্রী এখনো ফেরেনি দক্ষিণ মেরুর ভূগর্ভ শহর থেকে।

সুতরাং অমিত এখন সঙ্গীছুট। পুরুষ বন্ধু বলতে অমিতের প্রায় কেউই নেই। বন্ধু কেউ কারো হয়ও না। আজকাল। সবাই সবাইকে অবিশ্বাস আর সন্দেহ করে। খানিকটা বন্ধু হয় বরং মেয়ে-পুরুষে। তাও বেশি দিনের জন্য নয়। ভাল না লাগার ঢেউ এসে সম্পর্ক ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

স্টেশনের চত্বরটা বিশাল। মাটির নিচে দিনের মত উজ্জ্বল আলো স্টেশনের চত্বরেই হরেক জিনিসের দোকান, লাইব্রেরি, ছোট ছোট ব্যাটারিচালিত বগি গাড়ি এখানে সেখানে পড়ে আছে। স্টেশনের চত্বরের যে কোন জায়গায় যেতে হলে ইচ্ছেমত এসব বগি ব্যবহার করা যায়।

অমিত একটা বগি গাড়িতে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটিও বিনা প্রশ্নে উঠে তার পাশে বসে। সম্ভবত মেয়েটি বুঝতে পেরেছে, অমিত খুব নরম মনের মানুষ।

অমিত বগিটা ছেড়ে দিয়ে একটু হেসে বলল, 'কোথায়'?

তোমার সঙ্গে।

কেন?

আমি একা।

মাথা নেড়ে চিন্তিত মুখে বগিটা যদৃচ্ছা যেতে দিল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'একা কে নয়?'

অমিত মাথা নাড়ে।

মেয়েটি বলে, 'আমি বীথি। তুমি?'

'অমিত।'

থাকবে আমার সঙ্গে?

না।

কেউ চাইছে না । কেন? আমি কি খারাপ?

তা নয়।

খুব বেশি চাইব বলে ভয় পাচ্ছ?

পাচ্ছি। বলে অমিত বড় শ্বাস ফেলল।

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেলে। চোখ হল সুদূর। আস্তে করে বলল, 'আমি একটু বেশি চাই। ঠিক। কিন্তু তোমার কাছে চাইব না। শুধু থাকব।

একাই তো ভাল।

আমার ভয় করে।

অমিত একটু চমকে চাইল মেয়েটির দিকে। কচুরিপানা সরালে যেমন স্বচ্ছ জল, তেমনি মেয়েটির মুখ থেকে উগ্র কামের ভাবটি সরে যাওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে, মেয়েটির মুখে একটা কোমল লাবণ্য। সেই লাবণ্যের মধ্যে একটু ভয়ের শুষ্কতাও বুঝি আছে। অমিত বলে, 'ভয় কেন?'

মেয়েটি বলল, কি জানি! খুব ভয়।

বয়স?

কুড়ি। দু'হাজার সালে আমার জন্ম। আমি বড় হয়েছি দোলনায়।

যেসব বাচ্চাকে জন্মের পরই মা-বাবা ত্যাগ করতে চায় তাদের লালন-পালন করার জন্য সরকারের যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার নাম দোলনা।

ও। অমিত মুখটা ফিরিয়ে নেয়। তারপর বলে, হাজার হাজার লোক দোলনায় বড় হয়েছে।

সে সত্যি! কিন্তু আমার সমস্যা অন্য। আমাকে সবাই এড়িয়ে চলে, ভয় পায়।

অমিত গম্ভীর হয়ে বলে, এখন কি চাও?

চাই! বলে মেয়েটি যেন ভাবতে থাকে।

অমিত বগি গাড়িটা চালিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। রেস্তোরাঁর হলটি বিশাল। অজস্র লোক বসে খাচ্ছে। মানুষ খাবারের প্যাকেট কিনছে। আজকাল কেউ রান্নাবান্না করে না।

অমিত বগি থেকে নামে। সঙ্গে সেই মেয়েটি।

নিরিবিলি একটা টেবিলে গিয়ে তারা বসে। টেবিলের কাচের ওপর একটা ইলেকট্রনিক খাদ্যতালিকা পড়ে আছে। খাবারের নামের পাশে পাশে ছোট ছোট বোতাম। অমিত তিন-চারটে বোতামে চাপ দিল। মেয়েটি চাপ দিল একটি বোতামে।

খানিকক্ষণ বাদে পরোক্ষ চালিত একটি ট্রলি নিজে থেকেই গড়িয়ে এলো টেবিলের পাশে। তার ওপর তাদের পছন্দমত খাবার সাজানো।

অমিত তার খাবারের প্লেট তুলে নিতে নিতে দেখল, মেয়েটি শুধু এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয় চেয়েছে। এই বিশেষ পানীয়টিতে ওষুধ মেশানো থাকে। খেলে কিছুক্ষণের জন্য কোন শারীরিক অনুভূতি থাকে না আর খুব আনন্দ হয়।

তবে নেশা নয়।

অমিত বিরক্ত হচ্ছিল আবার করুণাও বোধ করছিল। খেতে খেতে সে বললে, 'এখান থেকেই কিন্তু আমরা যে যার পথে যাব।'

আমার পথ নেই। গন্তব্য নেই।

সে আমি জানি না।

তোমার কে আছে?

অমিত ভ্রূ কুচকে বলে, 'কয়েকদিন আমি একা। ভাল আছি।'

মেয়েটি ঢকঢক করে অনেকখানি পানীয় গিলে ফেলে। তারপর বোবা মুখে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

রেস্তোরাঁয় আরো বহু নগ্ন ও পোশাক পরা মেয়ে-পুরুষ রয়েছে। বেশিরভাগই সঙ্গীহীন। কথাবার্তার প্রায় কোনশব্দই নেই। হাসির আওয়াজ শোনা যায় না। আর একটা জিনিসও আজকাল দুর্লভ দর্শন– সেটা হচ্ছে শিশু। আজকাল শিশুরা প্রায় বর্জিত। মা-বাপ তাদের দায়িত্ব নেয় না। তারা বড় হয় দোলনায়।

অমিত চোখ তুলে দেখল মেয়েটি বিহ্বল চোখে একদৃষ্টে তাকেই দেখছে। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে পানীয়র ফেনা গড়িয়ে নেমে আসছে থুতনী বেয়ে।

মেয়েটি নতমুখে বোধ হয় নিজের শরীরের দিকেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর মুখ তুলতেই অমিতের মনে হল, এ মেয়েটির চোখে এককটা অদ্ভুত চকিত আলো খেলে যাচ্ছে। পাগল?

অমিত আস্তে করে বলে, আর কি চাও?

তোমাকে।

এমনভাবে বলল যে, অমিত একটু চমকে যায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে, আমিও আর পাঁচজন পুরুষের মত। কোন উত্তেজনা নেই।

তবু। আমি একা থাকব না।

আমার একা থাকাই দরকার।

আমি তোমার কাছে কিছু চাইব না। শুধু থাকব।

তোমার ডেরা কোথায়?

কোথাও কিছু নেই। আমি এর-ওর কাছে থাকি।

কেন? ডেরার তো অভাব নেই।

ডেরা থাকলেই তো একা।

ও। অমিত বিবরক্ত হয় আবার।

তুমি কেন রেগে আছ? আমি তো কিছু চাইনি।

কিন্তু...!

আমি নিজেকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব।

ঘুমোলে আর সঙ্গীর দরকার কি?

ঘুমের মধ্যেও আমি ভয় পাই যে, মনে হয়, কেউ খুন করবে।

আমার কাছে সে ভয় নেই?

হয়তো আছে।

আছেই তো। আমিও হয়তো খুন করতে পারি।

পারো?

নয় কেন?

মেয়েটি হেসে বলে, তবে অনুরোধ, ঘুমোলে মেরো না। জেগে থাকতে থাকতে মেরো।

অমিত অবাক হয়ে বলে, কেন?

ঘুম বড় ভাল জিনিস, তখন মারলে আমি কষ্ট পাব।

তাছাড়া এমনিতে মারলে কষ্ট পাবে না?

মেয়েটির মুখে মৃদু একটু রহস্যের হাসি। বলল, পাব। তবে আমার কাছে ঘুম আসে না। ঘুম আসে না কেন জান?

কেন?

ঐ ভয়েই। সব সময়ে মনে হয় আমি ঘুমোলে কেউ এসে আমাকে খুন করবে। ঘুমের মধ্যে খুন হতেই আমার যত ভয়।

অমিত এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। হাজারটা মানসিক রোগে মানুষ আজকাল ভুগুছে। কেউ পুরো পাগল, কেউ বা অস্বাভাবিক। টিপসি ঠিকই লিখেছে। তাই সে বলল, 'আমি খুনী নই। তবে ভাল লোকও নই।'

'আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমাকে ক'দিন একজন সঙ্গী দাও।'

'আমি সঙ্গী হিসেবেও ভাল নই। গুছিয়ে কথা বলতে জানি না, প্রশংসা করতে জানি না, এমন কি আমি কর্কশভাষীও। খুব রেগে যাই অল্পে।'

মেয়েটি পানীয় শেষ করার পর যথেষ্ট উজ্জ্বল ও লাল হয়ে উঠেছে। খুব গভীর শ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি খুব নরম মনের মানুষ।'

একথাটা আজকাল নিদ্রার সমগোত্রীয়। নরম মনের মানুষকে এ সমাজে কেউ পছন্দ করে না, বরং সন্দেহের চোখে দেখে। নরম লোকেরা সহজে আত্মীয়তা ভুলতে পারে না, ভাবাবেগের দরুন তারা দখলিত্ব রাখার চেষ্টা করে। তারা বাবা-মা হিসেবে দাবি ফলায়, প্রেম-ট্রেম জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, তারা পরিচিত করো মৃত্যু হলে দুঃখ পায়।

কিন্তু অমিত জানে, মেয়েটা মিথ্যে বলেনি। বাস্তবিক সে কিন্তু নরম মনের মানুষ। সে মেয়েটির দিকে না তাকিয়ে মুখভাব যথেষ্ট কঠিন করে রূঢ় গলায় বলে, আমি যা হই তোমার সঙ্গে আমার খাপ খাবে না। আমার সব সময়ে সঙ্গী ভাল লাগে না।

দয়া কর।

না।

আমি দরকার হলে চুপ করে থাকতে জানি। তুমি টেরও পাবে না আমি আছি।

টের পাবই।

আমি খুব ভাল ভাল কথা বলতে জানি।

কথা শুনতে আমার আর ইচ্ছে নেই।

মেয়েটি একটু ঝুঁকে চাপা স্বরে বলে, আমাকে সব সময়ে কে একজন যেন লক্ষ্য করে একা হলেই টের পাই।

বিরক্ত হয়ে অমিত বলে, বীথি এটা লক্ষ্য করার যুগ নয়। একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গোয়েন্দাগিরি দরকারি ব্যাপার ছিল। তখন তা নেই।

কিন্তু এটা গোয়েন্দার ব্যাপার নয়।

তবে?

আমার একটা টের পাওয়ার ক্ষমতা আছে।

বাজে কথা। অমিত খাবার শেষ করে টেবিল থেকে ভেজা তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছল। বলল, 'আর যদি লক্ষ্য করই তবে তো তুমি ভাগ্যবতী। বুঝতে হবে কেউ তোমাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।'

'এ লক্ষ্যটা সেরকম নয়। ঘৃণার।'

অমিত উদাস হয়ে বলে, 'মনে হওয়া আর মনে হওয়া। মানুষের অকারণে যতকিছু মনে হয়! তুমি কোন কাজ কর না?'

'আমি মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিলাম। সৌরলোকের সব গ্রহে আমি বারবার গেছি। ঠিক পনেরো দিন আগে ডাক্তারি পরীক্ষা করে কাজের অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।

এখন?

কিছু না। গ্রহে গ্রহে ঘুরে বেড়ানোর মত আনন্দ আর কোনো কাজে পাব?

অমিত নিজে সব গ্রহে যায়নি। একবার সরকারি কাজে তাকে মঙ্গল গ্রহে যেতে হয়েছিল। চাঁদে সে কয়েকবার গেছে। মেয়েটি সব গ্রহে গেছে জেনে তার মনটায় কি একটু নরম হল।

অমিত উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজকের রাতটা তুমি আমার কাছে থাকতে পারো। কিন্তু বেশি বকবক করবে না।

কৃতজ্ঞতায় মেয়েটি উদ্ভাসিত হয়ে বলল, 'না। তুমি শুনলে অবাক হবে, আমি এখনও কুমারী।'

অমিত ভ্রু কুচকে বলে, 'মিথ্যে কথা।'

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে, 'সত্যি।'

কোন পুরুষ তোমাকে নেয়নি?

না।

কেন?

আগে বল তোমার বয়স কত?

আমি চল্লিশ।

আমি মোটে ঊনিশ। তার অর্থ তোমার আর আমার মধ্যে একটা প্রজন্মের তফাৎ। সেটা ঠিক।

'তুমি বুঝবে না, আমাদের প্রজন্মে সক্ষম ও আগ্রহী পুরুষ কেউ নেই।'

সেটা ঠিক।

অমিত এরকম কথা শুনেছে। কানাঘুষোয় জেনেছে অত্যাধুনিক যুবকরা দেহমিলন সম্পর্কে প্রচণ্ড অনাগ্রহী।

কৌতূহলে অমিত জিজ্ঞেস করে, যুবকেরা খুব ঠাণ্ডা বলছ?

খুব।

কেন?

'কেন তা জানি না। তারা আগ্রহী নয় এটা দেখেছি।'

'তাহলে?'

মেয়েটি হেসে বলে, 'তারা ফিরিয়ে দেয় বলেই আমি তোমাদের মত বয়স্কদের কাছে গেছি। তারাও ফিরিয়ে দেয়। আমি কুমারী রয়ে গেছি।'

অমিত একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হয়তো মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না। একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে বারো তেরো বছর বয়স থেকেই আর কোন মেয়ে কুমারী থাকত না। মেয়েদের কৌমার্য ছিল দুর্লভতম জিনিস। খুব বেশি দিনের কথাও তা নয়। এত অল্পদিনেই সে অবস্থাটা উল্টে গেল কি?

অমিতের উদাসীন ভাবটা আর রইল না। পৃথিবীতে এখন কুমারী মেয়ে আছে এবং তাদের সংখ্যা বাড়ছে এই সত্য জানতে পেরে তার একধরনের জটিল আনন্দ হল।

মেয়েটির দিকে এবার অকপট আগ্রহ নিয়ে তাকায় অমিত। একটু হাসে আপন মনে। তারপর রেস্তোরাঁ থেকে বেরোনোর সময় ইচ্ছে করেই মেয়েটির একটা হাত নিজের হাতে ধরে।

কলিকাতার আট নম্বর উপনগরীর উপরিভাগে উঠে আসে তারা। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশে একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সূর্যের মতই আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সূর্যের মত অবিকল নয় এবং তাপও নেই। তবু চারদিকে এটা সুস্পষ্ট আছে; সব সময়ে পাওয়া যায়। তাছাড়া রাস্তার আলো আছে। দোকানপাট থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। অফুরন্ত আলো, পারমাণবিক তাপ-বিদ্যুৎ থেকে অঢেল শক্তির উৎস পাওয়া গেছে।

চলন্ত ফুটপাত ধরে খানিকে এগিয়ে তারা ফের সিঁড়ি বেয়ে মনোরেলের একটা স্টপে উঠে দাঁড়াল। অবিরল মনোরেল চলছে। খুব ভিড় নেই।

দু'জনে উঠে চুপচাপ। মেয়েটা অমিতের সঙ্গে কথা বলতে বোধহয় ভয় পাচ্ছে। অমিতের বাড়ি পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না। উপনগরীর একপ্রান্তে চমৎকার একটা কাচতন্তুর বাড়ি। এখানকার সমাজে নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। এ বাড়ি অমিতের নয়। সরকারি কোয়ার্টার মাত্র। তবে বাড়িটি চমৎকার। বৈঠকখানার দুটো দেয়াল স্বচ্ছ পলিথিনের তৈরি। বাসরের সবটুকু দেখা যায়।

শোওয়ার ঘরেও তাই।

মেয়েটি ঘরে ঢুকে চারদিকে দেখল। খুশি হল কিনা বোঝা গেল না। তবে বীথির মুখে একটা অসম্ভব স্বস্তি ফুটে উঠল। গভীর শ্বাস ফেলল সে। মুখখানা শিশুর মত হয়ে গেল। অমিত শান্তস্বরে বলল, 'কি করবে এখন?'

আমি ঘুমোব।

ঘুমোও।

মেয়েটি হঠাৎ অমিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, তুমি ঘুমের মধ্যে আমাকে মারবে না তো?

অমিত হাসল একটু। মাথা নেড়ে বলল, 'বলেছি তো আমি খুনী নই।'

বীথি অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে অমিতের দিকে। তার চোখে ঘৃণা নেই, ভালবাসা নেই, কাম নেই, কৌতূহল নেই, সন্দেহ নেই, ভয় নেই। তবে একটু বুঝি তৃপ্তি আছে।

অমিত বলল, 'ঘুমের ওষুধ বিছানার ধারেই আছে।'

আচ্ছা।

মেয়েটি ওষুধ খেল, বিছানায় গড়িয়ে পড়ল।

অমিত বেরিয়ে আসে বাইরে। সে এখন বাড়িতে বসে থাকবে না।

বেরিয়েই সে দাঁড়াল, ভাবল একটু। এ পাড়ায় গতকালও দুটো খুন হয়েছে। প্রায়ই হয়।

চমৎকার আলোয় পরিচ্ছন্ন রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে চায় অমিত।

এ পাড়া নির্জন।

বারবার বিদ্যুৎ চমকের মত অমিতের মনে পড়ছে তার বাতাসগাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারে নিখুঁত একটা ছ্যাঁদার ঘটনাটি। কোনো আধুনিক ড্রিল ব্যবহার করা হয়েছে ছিদ্র করতে। অত শক্ত ইস্পাতের বর্ম ভেদ করা বড় সহজ নয়।

আবার সে ভাবছে টিপসি সুলতানের টিপসের কথা। এ লোকটা কখনো বুজরুকী করেনি। টিপসি সুলতান কমপিউটার হোক বা মানুষই হোক– এ পর্যন্ত সবই নির্ভুল টিপ্‌স দিয়েছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অমিতের তেমন কোন মোহ ছিল না। যা হওয়ার হবে, অমিতের তাতে কি? সে তার জীবনটা কোনক্রমে কাটিয়ে গেলেই হল। কিন্তু আজকাল সে আর অতটা নিস্পৃহ নেই। পৃথিবী সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার আগ্রহ ক্রমে বাড়ছে। বীথি তাকে বলেছিল, সে নাকি নরম মনের মানুষ। শুনে প্রথমে তার রাগ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কথাটা মিথ্যেও তো নয়। পৃথিবী এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন কেউ মাথা ঘামায় না তখন তার কি দায় ঠেকল?

সম্বিতির মা এক নির্জন দ্বীপে আত্মহত্যা করছে; এই ছোট্ট, প্রায় তাৎপর্যহীন ঘটনা অনেকক্ষণ ধরে তার মনের আনাচে-কানাচে মারবেলের মতো গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সম্বিতি তার মার মৃত্যুতে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু অমিত কেন যে ভুলতে পারছে না, কেবলই মনে হচ্ছে একটা কি ঘটতে চলেছে। যা ঘটবে তা ভাল নয়। ভাল নয়।

অমিত ফিরে এসে তার বাসার সামনে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে, তার বাড়িটা খুব নিরাপদ নয়। একা ঐ কুমারী মেয়েটি– কোন বিপদ ঘটতে পারে তার অনুপস্থিতিতে। একটু ভ্রু কুঁচকে সে ভাবল। মনটা বড্ড নরম হয়ে এসেছে তার। লক্ষণটা ভাল নয়।

অমিত জোর করে মন থেকে অকাজের ভাবনা তাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে হেঁটে গিয়ে টিউব রেলের স্টেশনে নামার সিঁড়িতে পা দেয়।

খানিক দূর নেমে সে এসকালেটর ছেড়ে একটা চাতালে দাঁড়ায়। এখানে টেলিফোন বুথ।

অমিত টেলিফোন তুলে নম্বরের বোতামে হালকা আঙুলে চাপ দেয়।

একটু বাদেই ওপাশের একটা যান্ত্রিক গলা বলে ওঠে– 'সেক্টর আট... অনুসন্ধান... বলুন, আপনার কথা রেকর্ডে উঠছে।'

অমিত আস্তে করে বলে, 'আমি আট নম্বর সেক্টরের অমিত। কিউ আটাত্তরে আমার বাসা। আমার বাতাসগাড়ির নম্বর সি, এটি দু হাজার সাতশো বিয়াল্লিশ।'

তারপর?

আমার গ্যাস সিলিন্ডারে আজকে ছিদ্র করেছে।

রেকর্ড হচ্ছে। বলুন।

অমিত মৃদুস্বরে বলে, 'আমার অফিস সেক্টর এফ-এ। সরকারি অফিস। আমাদের কাজ পুরোনো সব নথিপত্র পরীক্ষা করা। আমি কাজ করি ইনফ্রারেডারে বিভাগে।

'অপেক্ষা করুন'। যন্ত্র জবাব দেয়।

একটু চুপচাপ। তারপর যন্ত্রের গলা বলে, 'হ্যাঁ, আপনি কে তা আমরা বুঝতে পারছি। আপনার বাতাসগাড়ির রেকর্ডও পাচ্ছি।'

আমি জানতে চাই, কে এই কাজ করেছে?

যন্ত্র কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলে, 'আর এক ঘণ্টা বাদে আমরা আপনাকে খবর দেব। আমাদের স্ক্যানার মেশিন আপনার বাতাসগাড়ি এবং আকাশের জায়গা পরীক্ষা করে সব তথ্য আপনাকে জানাবে।'

'আর একটা কথা–'

বলুন।

আমার সঙ্গে আজ একটি মেয়ের আলাপ হয়েছে। নাম বীথি। সে এক সময়ে মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিল বলে পরিচয় দিচ্ছে। সে যা বলছে তা কি সত্যি?

'অপেক্ষা করুন।'

আবার চুপচাপ। তারপর যন্ত্র হঠাৎ অমিতকে চমকে দিয়ে বলে ওঠে, 'না'।

'মানে?'

'সত্যি নয়। বীথি নামে কেউ মহাকাশ গবেষণার সহকারী ছিল না।'

নাম হয়তো বানিয়ে বলছে।

চেহারার বর্ণনা দিন।

মোটামুটি লম্বা, চমৎকার গঠন, সুন্দর মুখশ্রী, গায়ের রং বাদামি, তার মাথায় লম্বা চুলের মস্ত গোছা, যৌন ক্ষুধাতুর, কিন্তু কুমারী, বয়স কুড়ি।

'অপেক্ষা করুন।'

অমিত অপেক্ষা করলো।

একটু বাদে যন্ত্র বলে, 'আপনি আপনার সামনে টিভির সুইচ টিপুন।'

টেলিফোনের সামনেরই ঘষা কাচের পর্দা, নিচে বোতাম। অমিত বোতাম টিপতেই পর্দা উদ্ভাসিত হল আলোয়। তারপর নানারকম রেখার ঢেউ। আস্তে আস্তে রেখাগুলো স্থির হতে লাগল। ক্রমে রেখায় ফুটে উঠল একটি নগ্ন মেয়ের স্কেচ।

যন্ত্র বলে ওঠে, 'আপনার বর্ণনা অনুসারে আমাদের কমপিউটার এই স্কেচটি করেছে। মেয়েটি এ রকম কিনা দেখুন তো?'

অমিত দেখে। অনেকক্ষণ দেখে। না, মেলেনি, হুবহু মেলেনি।

অমিত বলে, না, মুখটা লম্বা হবে। চোখ আরো বড় এবং সরল।

অপেক্ষা করুন।

পর্দা সাদা হয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে আবার রেখার ঢেউ আসে। জমাট বাঁধে। আবার একটি মেয়ের রেখাচিত্র ফুঠে ওঠে।

যন্ত্রের গলা বলে, 'এবারে দেখুন।'

এখনো মেলেনি। অমিত আবার কয়েকটা সংশোধন করে। আবার পর্দা সাদা হয় এবং একটু বাদে আবার একটা মেয়ের ছবি আসে।

এইভাবে কয়েকবার চেষ্টায় মোটামুটি বীথির চেহারা পর্দায় এলো।

হ্যাঁ, অনেকটা এরকম।

অপেক্ষা করুন।

যন্ত্র চুপ করে যায়। অমিত অধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। যন্ত্র এবার অনেকক্ষণ সময় নেয়। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, আপনি সাবধান থাকবেন।

কেন? এ মেয়েটি বীথি। মেরু শহর পোলারিস-এর বাসিন্দা। কিছুদিন আগে সেখানে সবুজ খুনী নামে একটি সন্ত্রাসবাদী দল তৈরি হয়। এরা অত্যন্ত চরমপন্থায় বিশ্বাসী। এ মেয়েটি সেই দলের।

অমিত চমকে যায়। মেয়েটিকে ও রকম কিছু ভাবা তার পক্ষে শক্ত।

অমিত বলে, মেয়েটি সম্পর্কে আর কিছু বলুন।

দেখছি।

যন্ত্র চুপ। অনেকক্ষণ বাদে বলে, সে দোলনায় মানুষ হয়েছে। বাপ-মা কে তা অজানা। ছেলেবেলা থেকেই তার স্বভাব শীতল ও নিষ্ঠুর। কখনো ছোট-খাটো দুষ্টুমি করত না, খুব শান্ত থাকত। কিন্তু বাচ্চাবেলায় সে কীট-পতঙ্গ মেরে ফেলত। একটু বড় হয়ে সে জীবজন্তু মারতে খুব ভালবাসতো। সে কখনোই যৌনকাতর নয়। বরং ও ব্যাপারে তার তীব্র বিতৃষ্ণা আছে।

সে কি!

আমরা আপনাকে যথাযথ তথ্য দিচ্ছি।

কিন্তু সে যে প্রথমেই আমার কাছে শরীর চেয়েছিল।

যন্ত্র জবাব দেয়, সেজন্যই আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে। মেয়েটির সব কথা বিশ্বাস করবেন না। দোলনার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বীথি কোনদিনই যৌনমিলনে আগ্রহী হবে না। বরং ও রকম কিছু ঘটতে গেলে সে বিদ্রোহ করবে, হিংস্র হয়ে উঠবে প্রতিরোধ করবার চেষ্টায়।

আর কিছু জানাবার আছে?

যন্ত্র খানিকক্ষণ বাদে বলে, মেয়েটি পাগল বা মনোরোগী বলে চিহ্নিত নয়। তবে তার কতকগুলো বিশেষত্ব আছে! সে একা থাকতে চায় না। মৃত্যুভয় প্রবল।

সে কি কাউকে কখনো খুন করেছে?

করলেও রেকর্ড নেই। তবে কাজটা তার পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। বীথি ঘুমের ওষুধের গাড় নীল শিশিটা আলোর দিকে তুলে ধরে দেখে শিশিতে খুব বেশি বড়ি নেই, দুটো কি তিনটে।

তাহলে অমিত নামে এ লোকটাও আর দশজন লোক যেমন হয় তেমনিই। অর্থাৎ স্বাভাবিক ঘুম এরও নেই। পৃথিবীর খুব কম লোকই স্বাভাবিকভাবে ঘুমোয়, যাদের আপনা থেকে ঘুম আসে তারা বড় ভাগ্যবান।

বীথি শিশিটা রেখে দেয়। সে এক্ষুণি ঘুমোবে না। তার কাজ আছে।

কাচতন্তুর স্বচ্ছ দেয়ালের ধারে এসে সে দাঁড়ায়। এখন গ্রীষ্মকালের মেঘহীন আকাশ। পশ্চিমে এখনো ডুবে যাওয়া সূর্যের রক্তিম আভা একটুখানি আকাশের নিচে লেগে আছে, ভারি সুন্দর ঐ আভাটুকু।

বীথি সতর্ক চোখে দেখলো অমিত রাস্তা ধরে খানিক এগোল। থামলো, কি ভেবে ফিরে এলো বাসার দিকে। ভাবল। তারপর আবার হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পাতালে নামবার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলো।

বীথি ঘড়ি দেখছে। সাতটা বাজতে তিন মিনিট সাত সেকেন্ড।

আকাশে এখনো অজস্র বাতাসগাড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে। যত রাত বাড়ে, তত বাতাসগাড়ির চলাচল কমে যায়। এখন তেমন রাত হয়নি।

বীথি আস্তে এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে একটা সুইচ টিপল। স্বচ্ছ দেয়ালের ওপর একটা পর্দা পড়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে বীথি অমিতের বাসাটা দেখে।

একটা ঝকঝকে মরিচাহীন ইস্পাতের শীট দিয়ে তৈরি আয়নার সামনে দাঁড়ালো বীথি। অনেকক্ষণ সে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে থাকে। শরীরটুকুর মধ্যেই সে শেষ। তার শরীরের চারদিকে এই যে সুন্দর সাজানো ঘর, ঘরের বাইরে যে পৃথিবী, এত মানুষজন চারদিকে– এর কোনটার সঙ্গেই তার বনিবনা নেই, সম্পর্ক নেই, আদান-প্রদান নেই। সামান্যই তার বয়স। এখনো পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থাকতে হবে এবং সে বেঁচে থাকা হবে বড় একা একা।

আয়নার সামনে থেকে সরে আসে বীথি। ধীরপায় চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে। তেমন কিছু দেখার নেই। বসবার ঘরে একটা ভুয়ো বুক কেসের পেছনে সে একটা টিভি ট্রান্সমিশন ক্যামেরা দেখতে পায়। খুব বেশি লোকের বাড়িতে এ জিনিস থাকে না। অমিতের আছে। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে অমিত বহুদূর থেকে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখতে পারে।

বীথির কাছে এসব যন্ত্র খেলনার মত সহজ। সে খুবই দক্ষতার সঙ্গে ক্যামেরাটিকে অকেজো করে দিলো।

দেয়ালের মধ্যে প্রোথিত একটা ওয়ার্ড্রোব খুলে বীথি দেখতে পেল অন্তত কুড়ি রকমের মেয়েদের পোশাক সাজানো রয়েছে। বেশির ভাগই আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত পোশাক-যা পরলে শীতকালে শীত বা গ্রীষ্মে গরম লাগে না। রয়েছে আগুন ও জল নিরোধক কাচতন্তুর পোশাক।

বীথি খুব সাদামাটা নাইলনের একটা রোব বের করে পরল। কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি অবধি ঢাকা পড়ে গেল তার।

রান্নাঘরে এসে সে দেখে বহুকাল রান্নাবান্না কেউ করেনি এখানে। ঝকঝকে হিটার, বাসন-কোসন, যন্ত্রপাতি সব সাজানো। ধুলো, বাতাস, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রিত এই ঘরেও সব কিছুর ওপর পাতলা ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। খুবই আশ্চর্যের বিষয়, এই ঘরটিতে মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে, কয়েকটা পিঁপড়েও দেখতে পায় বীথি। একধারে একটা ছোট দরজার ওপরে লেখা দি ফ্রোজেন গার্ডেন। দরজাটা খুলে বীথি ভিতরে ঢুকে যায়।

লম্বা একটা গলি। দু'ধারে র‍্যাক সাজানো। তাতে অজস্র সতেজী সবজি ফলে আছে রাসায়নিক একটা স্তরের কৃত্রিম ক্ষেতে।

এই সব সবজির তেমন কোন স্বাদ বা গন্ধ নেই। তবে কাজ চলে যায়। ইচ্ছে করলে আরক মিশিয়ে কৃত্রিম উপায়ে স্বাদ গন্ধ তৈরি করে নেয়া যায়। বীথির খিদে পায়নি, রান্নাও সে করবে না। সে শুধু ঘুরে ঘুরে দেখে। কি দেখতে চাইছে তা বীথি জানে না।

অনেকক্ষণ ধরে এই কৃত্রিম সবজিবাগান দেখে ক্লান্ত বীথি ফের রান্নাঘরে চলে আসে। চট্‌জলদি কফির একটা যন্ত্র রয়েছে।

বীথি চাবি দিতেই আধ মিনেটের মধ্যে এক কাপ ফুটন্ত কফি পেয়ে গেল।

ঘুরে ঘুরে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বীথি রেকর্ড ঘরে গিয়ে ঢোকে। রেডিও টেপ-এর গুদাম বলা যায় ঘরটিকে। দেয়ালের গায়ে অজস্র চৌখুপীতে সাজানো টেপ। প্রত্যেকটা খোপের গায়ে ইলেকট্রনিক টাইপ দিয়ে লেখা কোনটা কোন বিষয়ের টেপ। একটা খোপের গায়ে লেখা আছে আমার কথা। বীথি টেপটা প্রক্ষেপণ যন্ত্রে লাগিয়ে দিয়ে যন্ত্রটা চালু করে।

একটা টেলিভিশন যন্ত্রে ছবি ফুটে ওঠে ঃ

অমিত তার বসবার ঘরে একটা কৌচে এলিয়ে বসে আছে। মুখখানা বিষণ্ন। অমিত আস্তে আস্তে বলে, আমি আজকাল মাঝে মাঝে খুব অদ্ভুত চিন্তা করি। আমার মনে হয়, পৃথিবীতে, এই সম্পূর্ণ বান্ধবহীন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের একজন ভালবাসার লোক চাই-ই। ভালবাসা কথাটা পুরানো এবং সম্পূর্ণ অচল। আমরা জানি কেবল কর্তব্য এবং উপভোগই শেষ কথা। ভালবাসা একটা ভাবাবেগ মাত্র। কিন্তু ভারী আশ্চর্যের বিষয়, মানুষের অন্তর্গত সেই ভাবাবেগের শুষ্ক নদীখাতে মাঝে মাঝে প্লাবনের ঢল নামে।... আমার স্ত্রী সম্বিতি আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে আমার কত নম্বর স্ত্রী ছিল সেটা কথা নয়। কিন্তু কথা হল, তাকে চলে যেতে হল। বীথি কফি খায়, একটু হাসে, শ্বাস টানে।

পর্দায় অমিত ভ্রু কুঁচকে নিজের হাতের তেলোর দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর চোখ তুলে বলে, এটা কোন ঘটনাই নয়। আমরা ক্রমে বিবাহহীন সমাজের দিকে এগোচ্ছি। কারও অন্য কোন মানুষ বা মেয়েমানুষের ওপর বিন্দুমাত্র দখলদারী থাকবে না। সমাজমুক্ত হবে। পরিবারের বন্ধন থাকবে না। আমি এর বিরোধী নই, কুপ্রথা দূর হওয়া ভাল। কিন্তু প্রশ্ন অন্য। মানুষ তার মরা নদীর এই অহেতুক বান কি করে সামলাবে?

বীথি নড়ে চড়ে বসে।

অমিত বলে, আমি অফিসে আটঘন্টা পরিশ্রম করি, তার যথাযোগ্য প্রতিদানও পাই। আমার কিছুই পাওয়ার নেই আর। সম্বিতির বদলে আজই আমার ঘরে আরও সুন্দরী মহিলার সমাগম ঘটতে পারে আমি ইচ্ছে করলেই। তবু এক মরা গাঙ আজ আমাকে কেন ডুব জলে নামিয়ে দিচ্ছে?

পর্দা সাদা হয়ে গেল একটুক্ষণের জন্যে। তারপর আবার ছবি আসে। ভারী সুন্দর একটি অল্প বয়সের মেয়ে একটা কলের দোলনায় অল্প অল্প দোল খাচ্ছে বসবার ঘরে। মেয়েটির মুখে হাসি। ঘরে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অমিতের গলার স্বর নেপথ্যে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে, জাফরি। এ আমার সঙ্গে বাস করছে গত তিন মাস- তিন মা-আ-স! জাফরি নতুন মাটি নিয়ে যে প্রকাণ্ড দ্বীপটি ভেসে উঠেছিল জলের ওপর, তাতে বাস করার উদ্দেশ্যের প্রথম পর্যায়ে যে তিনশো পরিবার সেখানে যায়, জাফরির বাবা মা ছিল সেই দলে। ত্রিশ বছরের মধ্যেই নিউ আইল্যান্ড এক স্বাধীন ও ক্ষমতাবান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই দ্বীপ-রাষ্ট্রকে বলা হয় ড্রিমল্যান্ড। সেখানে মানুষের অপ্রাপ্য কিছুই নেই। অভাব বোধ সেখানে শূন্য। গত শতাব্দীতে আমেরিকার যে ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছিল, নিউ আইল্যান্ডের খ্যাতি তার চেয়ে সহস্রগুণ বেশি। তবু সেখানকার মানুষ কতটা তৃপ্ত? জাফরিকেই জিজ্ঞাসা করা যাক।

জাফরি! অমিত ডাকল।

হু! ভারী সুন্দর মুখে ভাব করে জাফরি জবাব দেয়। নিউ আইল্যান্ড জায়গাটা কেমন? নতুন দ্বীপে, ভীষণ ভালগার।

কেন? বোরিং।

কেন?

আমরা সেখানে যা খুশি করতাম। ছেলে বেলা থেকেই। কোন অভাব ছিল না? অমিত প্রশ্ন করে।

অভাব! চোখ বড় করে জাফরি তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, অভাব কী! নিউ আইল্যান্ডে পাওয়া যায় না এমন কোন জিনিসের নাম করতে পারো? না তো! জাফরি অবাক হয়ে বলে, 'পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে বলে, কী আছে চাওয়ার?'

তোমরা কিভাবে বড় হয়েছে?

যেমন ভাবে সেখানে বড় হয়। যা খুশি করতাম। লেখাপড়া ছিল, খেলা ছিল, আর ছিল কত কিছু। নাচ গান হৈ-হুল্লোড়।

তাহলে তুমি খুব আনন্দেই ছিলা!

ভ্রু কুঁচকে জাফরি বলল, আনন্দ! না। বড় একঘেঁয়ে।

জাপরি তুমি কখনও কাউকে খুন করেছ?

খুন! ও, সেখানে সবাই সবাইকে খুন করতে চায়। করেও অনেকে। খুব সাধারণ ঘটনা সেটা।

শাস্তি হয় না?

হয়। রিফর্ম সেন্টারে পাঠানো হয়।

তুমি খুন করোনি?

করেছি। তিনবার। খুব ছেলে বেলায় একটি খুন করি রশ্মি বন্দুক দিয়ে। সে আমার সঙ্গে পিকনিকে যেতে চায়নি, কিন্তু আমি খুব চেয়েছিলাম, সে আমার সঙ্গে থাকে। সেটা আমার দশ বছর বয়সে ঘটে। পনেরো বছর বয়সে আমি আমার এক সুন্দরী বন্ধুকে খুন করি। আমার ছেলে বন্ধুরা তার কাছে চলে যেত। সতেরো বছর বয়সে আমি সন্ত্রাসবাদীদের দলে নাম লেখাই। পৃথিবীর জনসংখ্যা কমানোর জন্য পাইকারীহারে হত্যাই ছিল এদের উদ্দেশ্যে। খুব মজা ছিল তাতে। তৃতীয়বারে আমি এই সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে খুন করি। সেবার গ্রেনেড ছুঁড়ে একটা ক্লাব হাউসের প্রায় আড়াইশো মেয়ে পুরুষকে মেরেছিলাম।

অমিতের চাপা গলা পাওয়া গেল। স্বগতোক্তির মত সে বলছে, ‘মা! নিউ আইল্যান্ডের সব মানুষই এই রকম। তাদের মধ্যে কোন পাপবোধ নেই। তাদের কোন কাজের জন্য কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না। নিউ আইল্যান্ডের এই নিস্পৃহ দার্শনিকতা ক্রমশ পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই মনোভাবকে বোঝার জন্যই আমি জাফরিকে আমার কাছে রেখেছি। প্রতিদিন আমি বুঝতে পারছি....’ বীথি যন্ত্র বন্ধ করে দিল।

নিঃশব্দে সে উঠে এলো টেলিফোনের কাছে। কিন্তু যন্ত্রটা ব্যবহারের আগে সে একটু পরীক্ষা করে বুঝতে পারল, এই টেলিফোনটার নেপথ্যে কোথাও রেকর্ডার লাগানো আছে। যা কথা হবে তাই দলিল হয়ে থাকবে।

বীথি খুঁজতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড ফুলদানীর মধ্যে আর একটা টেলিফোনের সন্ধান পেল যেটার কোন গণ্ডগোল নেই। সংখ্যার বোতাম টিপে একটু অপেক্ষা করতেই ওপাশ থেকে একটা গমগমে পুরুষ গলা বলে ওঠে, বাজ বলছি।

আমি বীথি।

বল।

আমাদের চিহ্নিত লোকটি অপ্রকৃতিস্থ।

জানি। কী পেলে?

আমি তেমন কিছুই পাচ্ছি না। বীথি খুব উদার গলায় বলে।

ওপাশে পুরুষটি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, ‘ঠিক আছে, আলোটা নিভিয়ে দাও। কথাটার মানে বীথি জানে। আলো নিভিয়ে দেওয়া মানে খুন করা। আর এটাই হবে সুসির সর্বপ্রথম খুন।

ফোন রেখে বীথি কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হল খুন করা তেমন কঠিন কাজ নয়। তার দল বহুবার খুন করেছে। জাফরি নামে যে মেয়েটি একদা অমিতের সঙ্গে ছিল বীথিও তারই দলভুক্ত।

আবার ইস্পাতের আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায় বীথি। সাদা চোখে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু হায়! কোন পুরুষই তাকে একটু আদরও করেনি আজ পর্যন্ত। এই এক দুঃখ ছাড়া বীথির কোন দুঃখ নেই। তবে একটা ভয় আছে। যখনই ঘুম আসে তখনই মনে হয় কেউ তাকে ঘুমের মধ্যে মেরে ফেলবে।

অমিত কখন ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কিনা তার কোন ঠিক নেই। বীথি তার ডান পায়ের জুতো খুলে ছোট একটা অংশ হিল থেকে খসাল অংশটা একটা ক্ষুদের ব্যাটারির মত দেখতে। খুবই সহজ ব্যবহার করা। বোতাম টিপলে অদৃশ্যে রশ্মি বেরিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে ছ্যাঁদা করে দেয়।

যন্ত্রটাও হাতে নিয়ে সে ইস্পাতের আয়নার ঠিক মাঝখানটা লক্ষ্য করে বোতাম টিপল। খুব সমান্য একটু ঝলকানি আয়নার বুকে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। বীথি এগিয়ে দেখে, আয়নার মাঝখানে মটরদানার চেয়েও ছোট মাপের নিখুঁত একটা ছ্যাদা।

হাতের যন্ত্রটার দিকে অন্য মনে চেয়ে থাকে বীথি। এরকম যন্ত্র নানা কাজে বহুবার ব্যবহার করছে সে। কিন্তু খুনের জন্য এই প্রথম। যন্ত্রটাকে কেন যেন তার হাতে রাখতে ইচ্ছে হল না। বসবার ঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিল।

অমিত অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াল। লক্ষ্যহীন। সে বুঝতে পারছে, বীথিকে নিজের ঘরে স্থান দিয়ে সে বোধহয় ভাল কাজ করেনি। তার সামান্য ভয় করছিল।

যে দিনকাল পড়েছে তাতে ভয় করারই কথা। রাষ্ট্রনামে একটি মুখ বধির প্রতিষ্ঠান আছে বটে, কিন্তু এই ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে রাষ্ট্রকারও ওপরেই কোন নিয়ন্ত্রণ খাটায় না। ব্যক্তি সম্পর্কে রাষ্ট্রের কোন আগ্রহ নেই। মানুষ তার নিজের দায়িত্বে বেঁচে থাকে, নিজের দায়িত্বেই মরে। তাতে রাষ্ট্রের আহ্লাদ বা শোক নেই। সরকারী

কাজের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ চালায় অত্যাধুনিক কমপিউটার যন্ত্র। সে সব যন্ত্রের মস্তিষ্ক আছে, হৃদয় নেই। বাজেট তৈরী করে যন্ত্র, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থির করে যন্ত্র, কোথায় কোন প্রকল্প হবে বা হবে না সে সিদ্ধান্ত যন্ত্রই নেয়। এরকম যান্ত্রিক সরকারের কাছে মানুষ কতদূর কী আশা করতে পারে?

ভূগর্ভে স্টেশনে ট্রেন ধরে অমিত বহুদূর গেল, আবার ফিরে এলো। তারপর হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিল সে।

একটা স্টেশনে নেমে সে সোজা টেলিফোন বুথে চলে যায়। নম্বরে বোতাম টিপে অপেক্ষা করতে থাকে।

একটু বাদেই ওপাশ একটা গলা বলে ওঠে, ‘সংবাদ বিভাগ’।

আমি অমিত। পুরোনো তথ্য বিভাগে কাজ করি।

বলে যান।

অমিত একটু দ্বিধা করে বলে, আমার খুব বিপদ।

কি রকম বিপদ?

ঠিক জানি না। তবে আজ বিকেলে বীথি নামে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে জুটে গেছে। মনে হচ্ছে তার কোন উদ্দেশ্যে আছে।

আমাদের কী করার আছে? আপনি রক্ষীদলকে খবর দিন।

অমিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, আপনি একটু ভুল বুঝছেন। আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নই।

তবে?

যে যুগে এবং যে সমাজে বাস করছি তাতে যে কোন সময়ে আমার মৃত্যু ঘটতে পারে। সে জন্য মনে মনে প্রস্তুত আছি। মরতে ভয় পাই না, তা নয়। তবে মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তো পৃথিবী শেষ হয়ে যাচ্ছে না।

পৃথিবী। পৃথিবী নিয়ে আপনার ভাববার কিছু নেই। কেউ পৃথিবী নিয়ে ভাবে না। আমি ভাবি। স্বীকার করছি আমার মধ্যে কিছু সনাতন প্রবণতা আছে। আমি দুর্বল মনের মানুষ।

ওপার থেকে সামান্য হাসির শব্দ আসে। ভরাট গলায় জবাব পাওয়া যায়, আপনার ভাবনা কি নিয়ে?

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

কি জানতে চান?

টিপসি যা বলেছেন তাতে মনে হয়, পৃথিবীর ভবিষৎ খুবই বিষণ্নতায় ভরা। মানুষ আরো হৃদয়হীন হয়ে যাচ্ছে। পাগলে ভরে যাচ্ছে দেশ।

তা তো ঠিকই। টিপসি ঠিক কথাই বলেন।

আমি কিছু আশার কথা শুনতে চাই।

আশার কথা যদি কিছু না থাকে?

অমিত হতাশ গলায় বলে, তাহলে আমার মৃত্যু ঘটবে চূড়ান্ত দুঃখবোধের মধ্যে। মেয়েটি কি আপনাকে খুন করতে চায়?

‘জানি না। তবে সেটা সম্ভব।’ ‘লাভ নেই। ও একটি সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্য। ওকে ধরিয়ে দিতে পারি বা হত্যাও করতে পারি। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। ইচ্ছে করলেই ওরা আমাকে যখন তখন মেরে

ফেলতে পারে।'

'আপনার সন্দেহ অমূলক নয় তো!'

'অমুলক হলে ভালই। কিন্তু আজ বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময়ে আমি দেখি আমরি বাতাসগাড়ির গ্যাস ট্যাঙ্কে একটা ফুটো। বোধ হয়। কেউ ইচ্ছে করেই এই কাণ্ডটা করেছে। যাতে আমি ভূগর্ভ ট্রেন বা অন্য কোন যানবাহনে চড়তে বাধ্য হই।'

'তাতে সুবিধা কী?'

'আমাকে অনুসরণ করার জন্য সেটা দরকার ছিল। হয়তো পথের মধ্যেই কোথাও ওরা আমাকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল।'

'আপনি অনুমান করছেন।'

'করছি। কিন্তু অনুমানটা মরে যাওয়ার আগেই করা ভাল। নইলে পরে তো সময় পাওয়া যাবে না।'

'আপনার বাড়ির নম্বর এবং চ্যানেল বলুন।'

চমকে উঠে বলে, 'কেন?'

'আপনার ঘরে যদি রিভার্স টেলিভিশনের ব্যবস্থা থাকে তো আমরা মেয়েটিকে লক্ষ্য করব।'

অমিত দ্বিধা করল, 'কিন্তু অবশেষে নম্বরটা দিয়ে দিল।'

সামান্য অপেক্ষা করল অমিত। তারপরেই ওপাশ থেকে শোনা গেল, 'আপনার ঘরের যন্ত্রটি কি খারাপ?'

'না তো!' বিস্মিত অমিত বলে।

'তাহলে সেটা কেউ বিকল করে রেখেছে।'

একটা শীতল অমিতের মেরুদণ্ড স্পর্শ করে নেমে গেল।

অমিত বলল, 'ঠিকমত দেখুন।'

'ঠিকই দেখছি।'

হতাশভাবে অমিত বলে, 'যন্ত্রটা লুকোনো আছে। চোখে পড়ার কথা নয়।'

'কেউ খুঁজে বের করেছে। মেয়েটির পরিচয় কিছু জানেন?' 'কী জানব? আজকাল কে-ই বা নিজের সঠিক পরিচয় দেয়। আর পরিচয় দেওয়ার আছেই বা কি! আমি যেমন অমিত নামে একজন লোক, সেও তেমনি বীথি নামের একটি মেয়ে।'

ওপাশ থেকে কণ্ঠস্বর বলে, 'আপনি যেখানে থেকে কথা বলছেন সেখানে রিভার্স ক্যামেরা আছে?'

'আছে'।

'সুইচ অন করুন। আমরা আপনাকে দেখতে চাই।'

অমিত টেলিফোন বুথের দেয়ালে ক্যামেরার লেন্সটার পাশে ছোট্ট একটা বোতাম টিপল। যতদূর সম্ভব লেন্সের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল।

একটু বাদে কণ্ঠস্বর বলল, 'হ্যাঁ। আপনি অমিত। এর মধ্যেই আমরা আপনার সম্পর্কে সব খোঁজখবর নিয়ে এসেছি। আপনি নিজের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য।'

'আমার ভয়টাও সত্য?'

'হতে পারে! তবে আমরা নিঃসন্দেহ নই। ওরা আপনাকে কেন মারতে চায় তা জানেন?'

'না। আজকাল লোকে অকারণেও লোক মারে।'

'তা সত্য। কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারেন না? যে কোন সম্ভাব্য কারণ?'

'না।'

'আমাদের কাছে আপনি কী জানতে চান?'

'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।'

'ঠিক আছে। অপেক্ষা করুন।'

অমিত অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ। তারপর সামান্য একটু যান্ত্রিক শব্দ হয়।

হঠাৎ একটি থমথমে গলা বলে ওঠে, 'অমিত, আপনার পরিচয় আমি জানি, আপনি যা জানতে চান তাও।' বলেই কণ্ঠস্বর থেমে যায়!

মৃদুস্বরে অমিত বলে, 'দয়া করে জবাব দিন।'

ওপাশে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। থমথমে গলাটি যেন অনেক দূরে সরে গিয়ে বলে, 'মানুষের সামনে কোন পথ খোলা নেই।'

'নেই?'

'আপাতত নেই, আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জীন নষ্ট করে গেছেন। সেই মহতী বিনষ্টের বোঝা আমাদের বইতেই হবে।'

'কিভাবে পূর্ব পুরুষরা আমাদের জীন নষ্ট করলেন?'

'যথেচ্ছ বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন করে।'

'ইচ্ছাই তো বিবাহের মূল, তবে তা যথেচ্ছ হলে দোষ কী?'

'বংশধারা নষ্ট করে যে ইচ্ছা তাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। তাঁরা বিবাহ বা মিলনের ক্ষেত্রে বর্ণ মানতেন না, রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখার চেষ্টা ছিল না। তাছাড়া ছিল কামভিত্তিক বিবাহের ফলে অতৃপ্তি, বিচ্ছেদ, অস্থিরতা– যা মানুষদের ভিতরে নিরাপত্তার বোধ ও ভালবাসা নষ্ট করে দেয়।'

'মানুষের আবার বর্ণ কি? সমান সমান।'

'এ হল প্রকৃতি বিরুদ্ধ কথা। মানুষ সবাই সমান নয়, হতে পারে না। শ্রেণীভেদ আছে এবং থাকবে, নিজের বৈশিষ্ট্য ভাঙা উচিত নয়। উল্টোপাল্টা প্রজননের ফলে মানুষের জীন বিনষ্ট হয়েছে। এখন আমরা কেবল উন্মার্গগামী, পাগল, নিষ্ঠুর ও নিঃসঙ্গ মানুষের দেখা পাচ্ছি। এই প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অতি ভয়াবহ। মৃত্যু ছাড়া অন্য পরিণতি নেই।'

'সব অন্ধকার?'

'না, তা নয়। প্লাবনে সব ভেসে গেলেও কোথাও কিছু অঙ্কুর থেকে যায়, বীজ থেকে যায়।'

'সেরকম কিছু আছে?'

‘থাকতে পারে।’

‘আপনি নিশ্চিত কিছু বলতে পারেন না?’

‘না, যদি কয়েকটা মাত্র সুপ্রজনন মানুষ ঘটতে পারে, যদি কয়েকটি মাত্র স্নেহশীল নারী ও পুরুষের জন্ম হয় তাহলেও আশা আছে।’

অমিত চুপ করে যায়, একটু পরে বলে, ‘আমি হয়তো আজ রাতে মারা পড়ব। তার আগে এই আশার কথাটুকু আমার জন্য দরকার ছিল।’

দূরাগত গলা বলল, ‘কত লোককে হত্যা করার জন্য কত লোক ওঁৎপেতে রয়েছে।’

অমিত সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে, ‘আপনি কি মানুষ, না যন্ত্র?’

সামান্য হেসে ওপারের গলা বলে, ‘মানুষের ভালর জন্য কিছু লোক এখনো কাজ করছে। যন্ত্রের প্রভাবে তারা এখনো যন্ত্র হয়ে যায়নি।’

‘অনেক ধন্যবাদ।’

‘শুনুন, যে মেয়েটি আপনাকে হত্যা করার জন্য আপনারই ঘরে অপেক্ষা করছে তার জন্ম মোটামুটি ভাল।’

‘সে কে?’

‘তার বাবা-মা ছিল সুখী দম্পতি। গত শতাব্দীর শেষে তাঁদের বিয়ে হয় পুরানো প্রথায়, বর্ণাশ্রম মেনে। এই দশকের গোড়ার দিকে তাঁরা বিবাহহীনতার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার কাজে নামেন। ফলে কিছু উগ্র আধুনিক মানুষ তাঁদের মেরে ফেলে। মেয়েটি সবই জানে কিন্তু বলে না।’

অমিত বলে, ‘আমারও জন্ম হয়েছিল সুখী দম্পতির কোলে। কিন্তু পরে যুগের প্রভাবে আমার বাবা-মা বিচ্ছিন্ন হন।’

‘সেসব আমরা জানি। আপনারা বর্ণে বৈশ্য।’

অমিত চমকে ওঠে। বৈশ্য শব্দটা সে ভুলেই গিয়েছিল। বর্ণাশ্রম বা পদবী এ আমলে লোপাট হয়ে গেছে। বর্তমানে মানুষ কেবলমাত্র পদবীহীন নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়।

অমিত বলল, ‘হ্যাঁ, সে কথা সত্যি।’

ওপাশের মানুষ একটু হেসে বলে, ‘বীথিও তাই। যদিও ওর দেশ ভিন্ন, কিন্তু বর্ণে ও আপনার গোষ্ঠীভুক্ত।’

‘ও কি আমাকে মারবে?’

‘মারারই কথা।’

‘তাহলে?’

কণ্ঠস্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, ‘অন্যায়কে প্রতিরোধ করলে সবসময় লাভ হয় না।’

‘আপনি কি বলছেন আমি বিনা প্রতিরোধে ওর হাতে খুন হতে দেব নিজেকে? তাতে কি লাভ হবে?’

দূরের স্বর একটু ভেবে বলে, ‘যতদূর জানি এ মেয়েটি আগে কখনো খুন করেনি। যদি আপনাকে খুন করে তাহলে এই প্রথম। তবে মেয়েটির একটি মনোরোগ আছে। ও একা থাকতে ভয় পায়। আর এ রোগটা ওর পক্ষে খুবই উপকারী।’

‘কেন?’

‘তার ফলে ও হয়তো ওর সঙ্গীকে মেরে ফেলার আগে সময় নেবে, সঙ্গ চাইবে। ও আপনাকে হুট করে মারবে না।’

‘কিন্তু আমি কী করব?’

‘মানুষের কখন কী করা উচিত তা তার নিজেরই স্থির করা ভাল। বিশেষত আপনিও নিঃসঙ্গ এবং আপনিও মানুষকে নিয়ে ভাবেন ও আপনি কখনো কাউকে হত্যা করেননি।’

‘কিন্তু এ মেয়েটি আমাকে খুন করতে চায় কেন?’

‘মেয়েটি চায় না, ওর দল চায়। আর খুন ওরা আপনাকে করবে কিছু একটা করার জন্যই। অন্যকে খুন না করলে ওরা নিজেরা যে বেঁচে আছে তা বুঝবে কেমন করে?’

কেন যেন নিজেকে অপরিচ্ছন্ন লাগছিল বীথির। সে বাথরুমে গেল। আয়নায় নিজের দাঁত দেখে তার মনে হল দাঁতগুলো বড় অপরিষ্কার।

একটা অটোমেটিক টুথব্রাশ চালু করে বীথি। যন্ত্রটা তার মুখের মধ্যে সযত্নে ব্রাশ চালিয়ে ময়লা সাফ করে দেয়।

বীথি ঠাণ্ডা জলে স্নান করল ক্ষুদে সুইমিং পুলে নেমে। তারপর ড্রায়ার যন্ত্রের খোপে ঢুকে গায়ের জল শুকিয়ে নিল চোখের পলকে। সাজবার ঘরে ঢুকে একটা হেয়ার স্টাইলের যান্ত্রিক টুপি পরে নিল মাথায়। চুল আঁচড়ানো এবং সাজানো হয়ে গেল আপনা থেকেই।

সাদা রোব গায়ে ঘরে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে বীথি টের পায়, এসব ঘরে বহু পুরনো দিনের ঘাম, ধুলো, গন্ধ জমে আছে।

সাফাই যন্ত্রের চোঙ হাতে সে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য ময়লা আর নোংরা পরিষ্কার করতে থাকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরদোর ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

বীথি জানে, অমিতের ফেরার সময় হয়নি। তার সন্দেহ, তাদের দলের সর্দার নীল অমিতকে অনুসরণ করছে। সময়মত ঠিক বীথিকে সে খবর দেবে।

নীলের কথা ভেবে বীথি এখন একটু আড়ষ্ট হয়ে যায়।

নীল হচ্ছে সম্পূর্ণ পুরুষত্বহীন এক যুবক, বয়স বীথির মতই। কিন্তু এই অল্প বয়সেই তার চোখ কুটিল, মন জটিল এবং নিষ্ঠুরতা সীমাহীন। ওর মত বুদ্ধিমান ও নোংরা দু’টি মানুষ নেই। নীল কখনো সত্যি কথা বলে না। ওর মত বিশ্বাসঘাতকও দু’টি নেই। মাত্র সাত বছর বয়সে নীল তার মায়ের চোখে ওষুধ দেওয়ার বদলে অ্যাসিড ঢেলে অন্ধ করে দেয়। নীল মানুষকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, হত্যার প্রেরণা দেয়। তার বন্ধু না থাক অনুগামী অনেক, নীল ঠিক নিজের ছাঁচে সবাইকে তৈরি করছে।

ভাবতে ভাবতে ফোনে ডাক এলো।

বীথি ফোন ধরতেই নীলের বিরক্ত গলা ভেসে আসে– ‘কী করছ বীথি?’

বীথি সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, ‘কিছু না।’

‘রিভার্স ক্যামেরা চালু কর, আমি তোমাকে দেখতে চাই।’

বীথি আদেশ পালন করে।

নীল তাকে পর্দায় দেখে বলে, ‘তুমি স্নান করেছ?’

‘করলাম।’

‘আর কী?’

‘ঘর-দোর সাফ করলাম।’

‘ঘর তোমার নয়। কেন পরিষ্কার করছ?’

‘এমনি।’

বিরক্ত নীল বলে, ‘তৈরি থাক। অমিত এখন দু’নম্বর সেকটরে। বাড়ি ফিরছে। আমাদের সম্পর্কে সব খবর নিয়েছে। ও যে তোমার হাতে খুন হবে তাও জানে। সুতরাং ওকে মারতে কোন আনন্দ পাবে না তুমি, মরতেও ও প্রস্তুত, ভয় পেয় না। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রশ্মি চালাবে। দু’সেকেন্ডও দেরী করবে না। বাইরে আমি বাতাস গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করব, তুমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলেই তুলে নেব।’

‘ও যদি খারাপ লোক না হয়ে থাকে?’

‘তবু মারবে। আমরা মৃত্যু দণ্ডাদেশ ফিরিয়ে দিই না। তাছাড়া তোমার প্র্যাকটিসের জন্যও এ লোকটার মরা দরকার। আজ রাতে তোমার প্রথম খুন উপলক্ষে আমরা উৎসব করছি।’

ফোন নিশ্চুপ হয়ে যায়।

বীথি উঠে রান্নাঘরে আসে। আবার কফি তৈরি করে। আস্তে আস্তে কফি খেতে খেতে ঘুরে বেড়ায় চারিদিকে, গুনগুন করে গান গায়। একটু বাদেই তাকে জীবনের প্রথম খুনটা করতে হবে, এ কথা তার মনেই হয় না।

রাত হচ্ছে, বীথির খিদে পেয়ে যায়। অল্প দূরেই রেস্তোরাঁ রয়েছে। ফোন করে দিলেই ইলেকট্রিক ট্রলি বোঝাই খাবার চলে আসবে। সে নিজেও রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসতে পারে। কিন্তু একাকীত্ব কাটানোর জন্যই বীথি আবার রান্নাঘরে চলে আসে।

মাত্র দশ মিনিটেই স্বয়ংক্রিয় এক রাঁধুনী যন্ত্র তার জন্য সুস্বাদু তিন চার রকমের খাবার প্রসব করে। রান্নার সময় বীথি রাঁধুনী যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল, এই রান্নাঘর এর আগে কেউ ব্যবহার করেনি। যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আনকোরা রয়েছে।

বীথি পেট ভরে খেল। খাওয়ার সময় সে টের পেল, বহুক্ষণ সে কোন কিছুই খায়নি। বড় বেশি ক্ষুধাতুর ছিল সে। পেট ভরার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরে আর মনে কিছু পরিবর্তন আসে। ভারী স্নিগ্ধ লাগে। মন এবং শরীর ক্রমশ অলস হয়ে পড়ে।

বীথির গান শুনতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু যন্ত্রের গান নয়, সাদা গলার গান। ইচ্ছেটা খুব স্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার মন খুব চনমন করতে থাকে। ভারী ব্যাকুলতা বোধ করে সে। তার হাতে একটা সাজ্ঘাতিক কাজের দায়িত্ব রয়েছে, সে কথাও মনে পড়ে। রশ্মি যন্ত্রটা যে কোথায় রাখল সে!

চারদিকে একবার চাইল সে, কিন্তু তেমন খুঁজল না। এক্ষুণি দরকার নেই। আসলে সে নীলের আদেশ মানবে না। অমিতকে সে এক্ষুণি খুন করতে চায় না। একটু ভাব করতে চায়। কথা বলতে চায়। তারপর অবসর বুঝে যন্ত্রের বোতাম টিপলেই হল।

কখন একটা কৌচে বসে থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বীথি। মুখখানা অল্প হা করা, বাঁদিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে এলায়িত শরীর, চুলের গুচ্ছ মেঝে ছুঁয়েছে। সে টেরও পায়নি কখন নি’শব্দে দরজা খুলে অমিত ঢুকেছে ঘরে।

যখন চমক ভাঙল তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। সামলানোর সময় নেই।

এ লোকটা কে, কী যেন করতে হবে, বলেছিল নীল! কিছুতেই মনে পড়ছে না যে! ঘুমের নেশায় মগজ বড়

এলোমেলো। কফিতে কিছু মেশানো ছিল কি?

বীথি উঠে বসে দেখে, সামনে অমিত দাঁড়িয়ে। স্তম্ভের মত স্থির। অকপট চোখে তাকেই দেখছে। কতক্ষণ এসেছে ও?

বাইরে একটা আকাশ গাড়ির হর্ণ শোনা গেল। অধৈর্যের ইশারা! নীল নিশ্চয়ই। হর্ণ দিয়ে বলতে চাইছে, 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বেরিয়ে এসো।'

বীথি উদ্‌ভ্রান্তের মত ওঠে।

সামান্য বিষণ্ন হেসে অমিত বলে, 'তাড়া নেই।'

বীথি অবাক হয়। এ লোকটা তাকে কী ভীষণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল আজ বিকেলে! এখন বলছে, তাড়া নেই।

বীথি চারিদিকে চেয়ে তার রশ্মি যন্ত্রটা খুঁজল। দেখতে পেল না। কোথায় গেল সেটা।

অমিত পোশাক পাল্টাল না। বীথির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বলল, 'এতক্ষণ কেমন কাটল?'

'যেমন রোজ কাটে। একা।'

'তোমার কেউ নেই?'

'না।'

'আমারও না।'

এ কথায় বীথির অল্প একটু অভিমান হল। সে তো আগেই বার বার বলেছে একে যে, সে কত একা! সে কথা কি ও আগে শোনেনি? না কি গ্রাহ্য করেনি?

অমিত খুব সতর্কভাবে চারিদিকে চেয়ে বলল, 'তোমার জিনিসপত্র কোথায়?'

বীথি হেসে ফেলল, 'আমি কিছুই নিয়ে আসিনি। সে তো তুমি দেখেছ!'

বীথি সামান্য কেঁপে গেল ভিতরে ভিতরে। ও কী বলতে চায়? মাথা নেড়ে বীথি বলে, 'আমার কিছু নেই।'

'হৃদয়?'

'ওসব কুসংস্কার। পুরনো ঠাট্টা কর না।'

অমিত আস্তে উঠে দাঁড়ায়। একটু দূর গলায় বলে, 'বীথি, আমি প্রতিরোধহীন। পৃথিবীতে কেউ নিরাপদ নয়।'

বীথি চুপ করে থাকে। বাতাস গাড়ি হর্ণ দিচ্ছে।

অমিত শোওয়ার ঘরে যায় এবং বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলে, 'বীথি, ঘুমের মধ্যে মরতে আমার ভয় নেই।'

বীথি ভ্রূ কুঁচকে ভাবে। বাতাস গাড়ির হর্ণ তাকে ঘন ঘন তাগাদা দিতে থাকে।

বীথি ওঠে। ধীরে ধীরে সে সারাঘর খুঁজতে থাকে। কোথায় গেল তার রশ্মি যন্ত্র?

অনেকক্ষণ বাদে তার মনে পড়ে। সে গিয়ে সাফাই যন্ত্রের চোঙটা আলোয় তুলে দেখে। চোঙের ভিতরে ধাতব ছাঁকনিতে রশ্মি যন্ত্রটা আটকে আছে। যন্ত্রটা খুলে আনে বীথি। তারপর হাতে নিয়ে দেখে, বেঁকে-চুরে অকেজো হয়ে গেছে রশ্মি যন্ত্র।

বীথি ছুঁড়ে ফেলে দেয় যন্ত্রটা।

বাইরে নীল ডাকছে। কিন্তু বেশিক্ষণ ডাকবে না। আকাশে গোয়েন্দা পুলিশের ট্রেসার মডিউল ঘুরছে।

বীথি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। মস্ত চুলের গোছাটা হাতের আঙুল দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে বীথি আপন মনে বলে, 'একদিন যন্ত্রই যন্ত্রকে খাবে। সব খেয়ে ফেলবে। সেদিন আমরা সুখে থাকব।'

নীল ঘরে ঢুকল না।

অমিত ঘুমিয়ে রইল। বীথি রইল সারারাত পাহারায়।